মাআল আইম্মাহ

(ইলমি জগতে চার ইমামের জীবন, কর্ম, চিন্তা,
মতভেদ ও মতানৈক্যের সরল উপস্থাপনা)

মূল : ড. সালমান আল আওদাহ
ভাষান্তর : সাইফুল ইসলাম তাওহিদ

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

উম্মাহর পথিকৃৎ ইমামগণ	
যুগ সন্ধিক্ষণ	১৩
ইজমার যুগ	১৪
মূল ও শাখা-প্রশাখা	১৪
পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যতা	১৭
ইমামত ও যোগ্যতা	১৯
বিপদাপদ ও পরীক্ষা	২৩
ঐতিহাসিক বিন্যাস	২৬
ইমামদের প্রধান কিছু বৈশিষ্ট্য	২৮
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান	৩৩
ভারসাম্যের কেন্দ্রবিন্দু	৩৬
হক কি চার মাজহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ	৩৮
চার মূলনীতি	৪১
ইমামগণ নিষ্পাপ নন	৪৩
বাড়াবাড়ি ও কঠোরতার মাঝে ইমামগণ	৪৬
ইমামদের ইলম ও চারিত্রিক অবস্থান	৪৯
হকের দিকে ফিরে আসা একটি মহৎ গুণ	৫১
ব্যক্তি ও জনগণের অধিকার	৫৩
স্বভাব-চরিত্রের বৈচিত্র্য	৫৬
ইমামদের বিচ্ছিন্ন মতামত	৬৩
স্বভাব	৬৭
আমলের জন্য ইলম	৬৯
বংশের ভিন্নতা	৭২
সাহিত্যে বিচরণ	৭৪
আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব	৮২
ইতিহাসের পট পরিবর্তন	৮৫

ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.)	
জন্ম	৮৭
হাম্মাদ (রহ.)-এর মজলিশে	৮৮
বাহ্যিক অবয়ব ও দৃশ্য	৯০
আধ্যাত্মিক পাথেয়	৯৪
দুনিয়াবিমুখ ব্যবসায়ী	৯৭
বিচারকের পদ প্রত্যাখ্যান	৯৯
উত্তম সম্পদ	১০০
যুগ তাঁকে ফকিহ বানিয়েছে	১০২
মাদরাসাতুর রায়-এর প্রতিষ্ঠাতা	১০৫
হানাফি ফিকহের মূলনীতি	১০৬
অকাট্য প্রমাণ	১০৮
ছাত্রদের দেখাশোনা	১১০
আলিমদের সাক্ষ্য	১১১
প্রত্যাখ্যাত কথা	১১৩
অভিযোগ	১১৫
জবানের হেফাজত	১১৯
অন্তিম পথে	১২১

ইমামু দারিল হিজরাহ ইমাম মালেক (রহ.)	
শুভ জন্ম	১২২
ইলম অর্জন এবং তাঁর সম্পর্কে আলিমদের সাক্ষ্যদান	১২৩
তরুণ ফকিহ	১২৪
ব্যক্তিত্ব ও সৌন্দর্য	১২৭
যে ক্ষুধার্ত অতৃপ্ত থাকে	১২৯
আমরা দুজনই কল্যাণের পথে	১৩২
ইমাম মালেক ও লাইস ইবনে সাদ (রহ.)-এর মাঝে পত্র বিনিময়	১৩৪
লাইস ইবনে সাদের প্রতি ইমাম মালেক (রহ.)-এর পত্র	১৩৪
লাইস ইবনে সাদ (রহ.)-এর পত্র	১৩৮
আমিরুল মুমিনিন, তাদের ছেড়ে দিন	১৪৫
আপনি এমনটা করবেন না	১৪৯
নেতৃত্ব দেওয়ার আগে যোগ্যতা অর্জন করুন	১৫০
জটিল প্রশ্ন	১৫২

অপ্রয়োজনীয় বিদ্যা	১৫৪
আমি জানি না	১৫৭
আলিমের মর্যাদা	১৫৯
ইমাম মালেক (রহ.)-এর কঠিন পরীক্ষা	১৬৩
ব্যক্তিত্ব ও উপেক্ষা	১৬৭
নীরবতা ও গৃহে অবস্থান	১৬৮
আল্লাহর আদেশ	১৭৫

ইমাম শাফেয়ি (রহ.)
খোদা-প্রেমিক প্রাজ্ঞ ফকিহ ও দার্শনিক

জীবনকাহিনি	১৭৭
ইলমের প্রতি তীব্র আগ্রহ	১৭৯
প্রাজ্ঞ ফকিহ	১৮২
ভাষা, সাহিত্য ও শৈলী	১৮৪
অমূল্য বাণী	১৮৫
বিতর্কের শিষ্টাচার : তর্কের সৌন্দর্য	১৮৭
পক্ষপাতিত্ব ও নিরপেক্ষতা	১৯১
অনুপম চরিত্রের অধিকারী	১৯৩
মানবিকতা ও বদান্যতা	১৯৭
স্বাধীনতার প্রতি আহ্বান	১৯৮
রহস্যকথা	২০০
শাফেয়ি (রহ.)-এর প্রতি শিয়া অপবাদ	২০১
শাফেয়ি (রহ.)-এর প্রতি মুতাজিলার অপবাদ	২০২
পুরাতন ও নতুন মত	২০৪
ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর মত পরিবর্তনের কারণ	২০৪
'আর-রিসালাহ' গ্রন্থ	২০৬
গুণকীর্তন	২০৯
ইন্তেকাল	২১০

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)

জন্ম ও জন্মস্থান	২১২
ইলম অর্জনের জন্য ভ্রমণ	২১২
আমৃত্যু জ্ঞানসাধক	২১৪
মনীষীদের চোখে আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)	২১৫

ভেতর-বাইরের সৌন্দর্য	২১৬
তাফসির ও হাদিসের প্রতি গুরুত্ব	২১৮
ফকিহ ইমাম আহমদ	২২০
নব জাগরণ ও অনুসরণ	২২১
যশ-খ্যাতির পরীক্ষা	২২২
তাহাজ্জুদে মগ্ন রজনি	২২৫
ইমাম আহমদ (রহ.)-এর খোদাভীরুতা	২২৭
দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক	২২৮
নবিদের চরিত্র	২৩৪
ইমাম আহমদ (রহ.) ও জনসাধারণ	২৩৫
খালকে কুরআনের ফিতনা	২৩৭
মামুনের যুগে	২৩৭
মুতাসিমের যুগে	২৩৯
ওয়াসেকের যুগে	২৪২
ইমাম আহমদ (রহ.)-এর জীবন : দীপিত আলোকমালা	২৪৩
ক্ষমা ও আপসের অনুপম দৃষ্টান্ত	২৪৫
সমসাময়িক আলিমদের সান্নিধ্যে	২৪৬
ইমাম শাফেয়ি (রহ.)	২৪৬
ইবনে হুমাম আল ইয়ামানি আস সানআনি (রহ.)	২৪৮
ইবনু আবি দুআদ	২৪৯
ইন্তেকাল ও জানাজা : ভক্তি ও ভালোবাসার অপূর্ব ছবি	২৫১

উম্মাহর পথিকৃৎ ইমামগণ

যুগ সন্ধিক্ষণ

সমগ্র মুসলিম উম্মাহর পথিকৃৎ চার ইমামের আবির্ভাব ঘটেছিল ইতিহাসের এক সোনালি যুগে। ইতিহাসের পাতায় চোখ বোলালে সে সময়ের দুটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়—

প্রথম, আত্মপরিচয়, ব্যক্তিত্ব সংরক্ষণ, আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগি, চালচলন ও জীবনযাপনে ইসলামি মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরা। এই ইসলামি মূল্যবোধের মাঝেই নিহিত আছে উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্ব, শক্তি ও সামর্থ্য। নিহিত আছে উম্মাহর মাহাত্ম্য, শিক্ষার মৌলিকত্ব ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিত্তি। চার ইমাম কর্তৃক চার মাজহাবের পথচলার মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসে এক নবযাত্রার সূচনা হয়। এতে অনুসরণ, সম্পর্ক নবায়ন ও মানহাজ প্রতিষ্ঠার দাবি ফুটে ওঠে।

চার ইমামের মান-মর্যাদা ও অবস্থান ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত ও সুনির্ধারিত। এই সম্মান শুধু তাঁদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাঁদের বোধশক্তি, পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিভিন্ন মাসয়ালার সমাধান বের করার যোগ্যতা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সুবিস্তৃত।

দ্বিতীয়, পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সমস্যা ও সংকট মোকাবিলা করার মানসিকতা লালন করা। মানবজীবনে সমস্যা ও সংকটের আবর্তন সৃষ্টিজগতে আল্লাহ তায়ালার একটি চিরায়ত নিয়ম ও দস্তুর। মানুষের জীবনে এই সমস্যা ও সংকট বহতা নদীর মতো, যার স্রোত কখনো থামতে জানে না। উম্মতের পরিধি যত বড়ো হবে, এই সমস্যা ও সংকটের মাত্রাও তত বৃদ্ধি পাবে। দিন দিন উম্মাহর পরিসর বাড়ছে। প্রতিদিন অনেকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে পরিবেশ-পরিস্থিতিতেও ব্যাপক পরবির্তন আসছে। মুসলমানরা নতুন নতুন জাতির সাথে মেলামেশা করছে। ফলে নিত্য-নতুন সমস্যা ও সংকট তৈরি হচ্ছে। এই সমস্যা ও সংকট মোকাবিলা করা প্রয়োজন।

চার ইমাম ছিলেন নববি যুগ, কুরআন অবতীর্ণের যুগ ও সাহাবিদের যুগের কাছাকাছি সময়ের। ফলে তাঁরা রাজনীতি ও সভ্যতার উন্নত যুগের সাথে সেতুবন্ধন স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইজমার যুগ

চার ইমামকে উম্মাহর সবাই ইমাম হিসেবে মেনে নিয়েছে। এটা কাকতালীয়ভাবে ঘটেনি। তাঁদের অবস্থান, মান-মর্যাদা ও অবদান পুরো মুসলিম জাতির ঐক্যের ভিত্তিতে স্বীকৃত। পুরো মুসলিম

জাতি ফিকহি ও আকিদাগত বিষয়ে তাঁদের অনুসরণ করে আসছে। ফিকহি মাসয়ালা সমাধানের জন্য তাঁদের ওপরই নির্ভর করছে।

প্রত্যেক ইমামের কিছু অনুসারী সুনির্দিষ্ট। ইমামদের মধ্যে শাখাগত বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও ঈমান, মাসয়ালা উদ্‌ঘাটন ও ইজতিহাদের মৌলিক নিয়মনীতিতে কারও দ্বিমত নেই। এর অর্থ হলো—উম্মাহ সামগ্রিকভাবে যদিও চার ইমামের অনুসারী, তারপরও তাদের মাঝে মাসয়ালার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে।

ফিকহি বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা দূষণীয় নয়। এটি শরিয়াহর প্রশস্ততা ও উদারতার বহিঃপ্রকাশ। আর ফিকহি বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধের তুলনায় ঐকমত্যের পরিমাণ বেশি।

মূল ও শাখা-প্রশাখা

চার ইমামের গবেষণাকর্ম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মৌলিক ও বুনিয়াদি বিষয়গুলোতে তাঁরা সকলেই একমত; মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে মূলত শাখা-প্রশাখাগত আলোচনায়।

ইমামগণ যে মাসয়ালায় ইখতিলাফ করেছেন, সেটা আদতেই মতভেদপূর্ণ মাসয়ালা। তাঁদের এই মতভেদ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ইখতিলাফের পথ সুগম করেছে। ইমামদের মাজহাবে যে মতামত রয়েছে, তা নির্ভরযোগ্য মতামত। এসব মতামত আলিমদের পদস্খলন কিংবা বিচ্ছিন্ন কোনো মতামত নয়; বরং যথার্থ মূলনীতির ভিত্তিতে কুরআন-সুন্নাহর যৌক্তিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

কোনো মাসয়ালায় যখন ইমামগণ ইজতিহাদ করেন, তখন একজনের মতই কেবল সঠিক হয়; বাকিদের মত সঠিক না হলেও তাঁরা ইজতিহাদের সওয়াব পেয়ে যান। মাসয়ালায় ইমামদের মতভেদ, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রমাণ-পদ্ধতি ইত্যাদিই বলে দেয়—এই মাসয়ালায় মতভেদ করার সুযোগ রয়েছে। এই মাসয়ালায় মতভেদ অনুমোদিত। ব্যাপারটা এ রকম—মাসয়ালাটি মতভেদপূর্ণ বলেই তাঁরা মতভেদ করেছেন। তবে মতভেদের ক্ষেত্রে তাঁরা একে অন্যের মত প্রত্যাখ্যান করেননি; বরং পরস্পরের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করেছেন। ইমামদের মতভেদের কারণে একটি মাসয়ালায় অনেকগুলো দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে।

খলিফা আবু জাফর আল মনসুর মালেকি মাজহাবকে গ্রহণযোগ্য মাজহাব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তা সমস্ত নগরীতে ছড়িয়ে দিতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু ইমাম মালেক (রহ.) তাকে বাধা দিয়ে বলেছিলেন—'আমিরুল মুমিনিন! এ রকম করবেন না। মানুষের কাছে আগে থেকেই কিছু মত পৌঁছেছে। আগে থেকে তারা কিছু হাদিস শুনেছে। ভিন্ন ভিন্ন হাদিস ও ভিন্ন ভিন্ন ফিকহি মত তারা বর্ণনা করেছে। প্রত্যেক দলের কাছে যা আগে পৌঁছেছে, তা তারা গ্রহণ করেছে। তার ওপর আমল করেছে। রাসুল ﷺ-এর সাহাবিদের মাঝেও মাসয়ালাগত মতভেদ ছিল। লোকজন তা মেনে নিয়েছে। তারা যা বিশ্বাস করেছে, তা থেকে তাদের ফিরিয়ে আনা কঠিন ও দুষ্কর। আপনি তাদের

নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিন। তারা যে বিশ্বাস ও মতের ওপর আছে, তা নিয়ে থাকতে দিন। প্রত্যেক এলাকার মানুষ নিজেদের জন্য যা পছন্দ করেছে, তা নিয়েই তাদের থাকতে দিন।'

ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল আনসারি (রহ.) বলতেন—'আলিমগণ স্বভাবতই উদারমনা। বিভিন্ন মাসয়ালা নিয়ে তাঁরা মতভেদের মধ্যে আছে, থাকবে। একজন হালাল বললে অন্যজন বলে হারাম। তাঁরা হালাল-হারাম বর্ণনার মাঝে থাকলেও কখনো একে অন্যকে দোষারোপ করেন না। পরস্পরকে প্রতিপক্ষ বানানো আলিমদের স্বভাব নয়।'[১]

ইমামদের মতভেদের পূর্বে সাহাবিরাও মতভেদ করেছেন। তাঁদের এই মতভেদ ছিল রহমতস্বরূপ। আর ঐকমত্য ছিল অকাট্য প্রমাণ; যেমনটা ইবনে কুদামা (রহ.) বলেছেন।[২]

উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) বলেন—

> 'রাসূল ﷺ-এর সাহাবিগণ মতভেদ না করুক, এমনটা আমার কাছে পছন্দনীয় নয়; বরং তাঁদের মতভেদেই আমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। কারণ, তাঁরা মতভেদ না করলে আমাদের জন্য কোনো ছাড় থাকত না।'[৩]

ইসহাক ইবনে বাহলুল আল আনবারি একবার একটা কিতাব নিয়ে ইমাম আহমদ (রহ.)-এর কাছে এসে বলেন—'আমি এতে সকল মতভেদকে একত্র করেছি এবং এর নাম দিয়েছি *কিতাবুল ইখতিলাফ*।' ইমাম আহমদ (রহ.) বললেন—'এর নাম *কিতাবুল ইখতিলাফ* না রেখে নাম রাখো *কিতাবুস সাআ* তথা প্রশস্ততার কিতাব।'[৪]

তালহা ইবনে মুসাররিফের কাছে মতভেদ বা ইখতিলাফের কথা বলা হলে তিনি বলতেন—'ইখতিলাফ বলো না; বলো প্রশস্ততা বা ব্যাপকতা।'[৫]

ভিন্নমত পোষণকারীর প্রতি উদারতা প্রদর্শন করা এবং অন্যের মত খোলা মনে গ্রহণ করে নেওয়া মহান চরিত্রের পরিচায়ক। মহান ইমামগণ এই চরিত্রেরই অধিকারী ছিলেন। তাঁদের মাঝে ছিল আকাশসম উদারতা। মনে ছিল না কোনো সংকীর্ণতা। তাঁদের এই উদারতা ও প্রশস্ততা সকলকে বিমোহিত করে।

---

[১] ইমাম জাহাবি, *তাজকিরাতুল হুফফাজ* : খণ্ড.-১, পৃ.-১০৫; *আল মাকাসিদুল হাসানা* : পৃ.-৭০; *কাশফুল খিফা* : খণ্ড.-১, পৃ.-৭৫

[২] *লাময়াতুল ইতিকাদ* : পৃ.-৪২

[৩] *আল ইবানাতুল কুবরা*, পৃ.-৭০৩; *আল ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ* : খণ্ড-২, পৃ.-১১৬; *ফয়জুল কাদির* : খণ্ড. ১, পৃ.-২০৯

[৪] *তবাকাতুল হানবিলা* : খণ্ড-১, পৃ.-২৯৭; *মাজমুউল ফতোয়া* : খণ্ড-১৪, পৃ.-১৫৯; *আল-মাকসাদুল আরশাদ* : খণ্ড. ১, পৃ.-২৪৮

[৫] *আল ইবানাতুল কুবরা* : খণ্ড. ২, পৃ.-৫৬৬; *আবু লাইস সমরকন্দি, বুসতানুল আরিফিন*, পৃ.-৩০৮; *হিলয়াতুল আউলিয়া* : খণ্ড. ৫, পৃ.-১৯; *আস-সাওদাতু ফি উসুলিল ফিকহি* : পৃ.-৪৫০; *আশ-শারানি, আত-তাবকাতুল কুবরা* : খণ্ড.-১, পৃ.-৩৭

ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.)

তিনি হলেন আবু হানিফা আন নুমান ইবনে সাবিত।[৬]
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জন্মস্থান নিয়ে জীবনীকারদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তাঁর জন্ম হয়েছিল কাবুলে না বাবেলে, নাসাতে না তিরমিজে নাকি আনবারে—এ নিয়ে মতামতের শেষ নেই।

অনেকের ধারণা, তিনি মূলত এসব অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন, তাই এ দিকে সম্বন্ধ করে এমনটা বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের এই ধারণা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।[৭]

খতিব বাগদাদি (রহ.) বর্ণনা করেন, ইসমাইল ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবি হানিফা (রহ.) বলতেন—'আমি ইসমাইল ইবনে হাম্মাদ ইবনে নুমান ইবনে সাবিত ইবনে নুমান ইবনে মারজুবান। স্বাধীন পারসিকদের অন্তর্ভুক্ত। আমরা কখনো দাসত্ববরণ করিনি। ৮০ হিজরিতে আমার দাদা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জন্ম। আমার পরদাদা সাবিত শৈশবে আলি (রা.)-এর দরবারে গিয়েছিলেন। আলি (রা.) তাঁর ও তাঁর অনাগত বংশধরদের জন্য বরকতের দুআ করেছিলেন। আমরা আল্লাহর কাছে আশাবাদী, তিনি আমাদের ব্যাপারে আলি (রা.)-এর দুআ কবুল করেছেন।'[৮]

ইসমাইল ইবনে হাম্মাদের এ বর্ণনা উল্লেখ করে আস-সিরাজ আল হিন্দি[৯] বলেন—'ইসমাইলের ভাইও এ রকম বলেছেন। তাই কারও জন্য এমন ধারণা করা ঠিক হবে না যে, নিজেদের সুমহান মর্যাদা ও পরহেজগারিতা সত্ত্বেও তারা নিজ পিতা ছাড়া অন্য কারও দিকে নিজেদের সম্বন্ধযুক্ত করে থাকতে পারেন।'[১০]

জন্ম

আবদুল কাদের আল কুরাশি বলেন—'৮০ হিজরিতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন। এটাই সঠিক মত।'[১১]

ইমাম জাহাবি (রহ.) বলেন—'ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ৮০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় সাহাবিদের অনেকে জীবিত ছিলেন। আনাস ইবনে মালেক (রা.) কুফায় আগমন করলে

---

৬ তাহজিবুল আসমা ওয়াল লুগাত : খণ্ড-২, পৃ.-৫০১; তাহজিবুল কামাল : খণ্ড-২৯, পৃ.-৪২২; সিয়ারু আলামিন নুবালা : খণ্ড-৬, পৃ.-৩৯০

৭ আজ জামিরি, আখবারু আবি হানিফাতা ওয়া আসহাবিহি, পৃ.-১৫; তারিখে বাগদাদ : খণ্ড-১৩, পৃ.-৩২৬; ইবনে খল্লিকান, ওফিয়াতুল আয়ান : খণ্ড-৫, পৃ.-৪০৫

৮ তারিখে বাগদাদ : খণ্ড-১৩, পৃ.-৩২৭

৯ প্রকৃত নাম উমর ইবনে ইসহাক ইবনে আহমদ আল গজনবি। তবে আবু হাফস আল হিন্দি আল মিশরি নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। তিনি হানাফি মাজহাবের ফকিহ ছিলেন। ৩৭৩ হিজরিতে তিনি মিশরে মারা যান।

১০ *আত-তবাকাতুস সুন্নিয়া ফি তারাজিমিল হানাফিয়া* : খণ্ড-১, পৃ.-৮৭

১১ *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : খণ্ড-৬, পৃ.-৩৯১; *আল জাওয়াহিরিল মাজিয়া ফি তবাকাতিল হানাফিয়া* : খণ্ড-১, পৃ.-৫৩

তাঁর সাথে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সাক্ষাৎ করেন। তবে কোনো সাহাবি থেকে তাঁর কিছু বর্ণনা করার বিষয়টি প্রমাণিত নয়।’

আবদুল কাদের আল কুরাশি বলেন—‘অনেকে দাবি করে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) আটজন সাহাবি থেকে শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে অনেকে আলাদা আলাদা গ্রন্থও রচনা করেছেন।[১২] এ ধরনের কিছু কথা আমরাও আমাদের শাইখ থেকে শুনেছি ও বর্ণনা করেছি। এ বিষয়ে আমি নিজেও একটি গ্রন্থ রচনা করেছি। তাতে উল্লেখ করেছি, তিনি কোন সাহাবি থেকে শুনেছেন, আর কোন সাহাবিকে দেখেছেন। খতিব বাগদাদি (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছি, তিনি আনাস ইবনে মালেক (রহ.)-কে দেখেছেন। আর যারা বলেছেন তিনি তাঁকে দেখেননি, আমি তাদের মতও খণ্ডন করেছি।’[১৩]

হাম্মাদ (রহ.)-এর মজলিশে

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাদিস ও ফিকাহ চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। অসংখ্য তাবেয়ির কাছ থেকে ইলম অন্বেষণ করেন। নিজেকে সমৃদ্ধ করেন জ্ঞান-গরিমায়। এমনকী তিনি একজন বড়োমাপের অনুসরণীয় ইমামে পরিণত হন।

শৈশবেই তিনি ইলম অর্জনে আত্মনিয়োগ করেননি। এ সময় ব্যাবসা-বাণিজ্য করার জন্য তিনি বাজারে যেতেন। একদিন আমির ইবনে শারাহিল আশ-শাবি তাঁকে নসিহত করেন। ইলম অর্জনের প্রতি তাঁকে উৎসাহিত করেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কীভাবে ইলম অর্জনে ব্রতী হন, তা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—‘একদিন আমি ইমাম শাবি (রহ.)-এর পাশ দিয়ে বাজারে যাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে ডেকে বললেন—“তুমি কোথায় যাচ্ছ?” আমি বললাম—“বাজারে যাচ্ছি।” তিনি বললেন—“আমি তোমার বাজারে যাওয়ার কথা জানতে চাইনি। আমি জানতে চেয়েছি, তুমি কোন আলিমের কাছে যাচ্ছ?” আমি বললাম—“আলিমদের মজলিশে আমার আসা-যাওয়া কম।”

তিনি বললেন—“তুমি আলিমদের থেকে বিমুখ হয়ো না। তাঁদের সান্নিধ্য গ্রহণ করো। তাঁদের থেকে ইলম অর্জন করো। আমি তোমার মাঝে ভালো কিছু দেখতে পাচ্ছি। ইলম সংরক্ষণের উপযুক্ত পাত্র তোমার মাঝে রয়েছে। আমি তোমার মাঝে সজীবতা ও সচেতনতা লক্ষ করছি।”

“তাঁর কথাটি আমার মনে ধরে। আমার হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আমি বাজারে যাওয়া বাদ দিয়ে ইলম অর্জন শুরু করি। তাঁর নসিহা দ্বারা আল্লাহ আমায় উপকৃত করেন।”’[১৪]

---

[১২] আবু মাশার আবদুল করিম বিন আবদুস সামাদ তাবারি তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ৪৭৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। দ্র. ইমাম সুয়ুতি, তাবয়িদুস-সহিফা ফি মানাকিবিল ইমাম আবি হানিফা : পৃ.-১৩

[১৩] তারিখে বাগদাদ : খণ্ড-১৩, পৃ.-৩২৫; *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : খণ্ড-৬, পৃ.-৩৯১; *আল জাওহিরিল মাজিয়া ফি তবাকাতিল হানাফিয়া* : খণ্ড-১, পৃ.-৫৩

[১৪] *মুওয়াফফিক ইবনে আহমদ আল মক্কি* : খণ্ড-১, পৃ.-৫৯; ইবনে হাজর হায়তামি, *আল খায়রাতুল হাসান ফি মানাকিবিল ইমামিল আজাম আবি হানিফাতান নুমান* : পৃ.-২৭

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে তাঁর ইলম অর্জনের সূচনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন—'আমি ইলম ও ফিকহের খনি হিসেবে খ্যাত কুফা নগরীতে ছিলাম। সেখানের লোকদের সাথে উঠাবসা করলাম। তাদের থেকে একজন বড়ো ফকিহর সান্নিধ্য গ্রহণ করলাম।'

যার অবদানে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম ও ফকিহে পরিণত হন, তিনি হলেন হাম্মাদ ইবনে আবু সোলায়মান (রহ.)। দীর্ঘ ১৮ বছর তাঁর সান্নিধ্যে থেকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইলম অর্জন করেছেন। এ সুদীর্ঘ সময়ে ইমাম হাম্মাদ (রহ.) তিলে তিলে আবু হানিফা (রহ.)-কে গড়ে তুলেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠনে অবদান রেখেছেন।

আবু হানিফা (রহ.) হাম্মাদ (রহ.)-এর মজলিশে বসা শুরু করলেন। ওস্তাদ হাম্মাদ (রহ.) তাঁর মাঝে দেখতে পেলেন প্রচণ্ড ধীশক্তি, ইলমের প্রতি অদম্য আগ্রহ। তিনি আরও দেখলেন, তাঁর মাঝে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্যদের থেকে তাঁকে আলাদা করে। তাই তিনি বলে দিলেন, 'আমার মজলিশের প্রথম সারিতে, আমার সম্মুখে যেন আবু হানিফা ছাড়া আর কেউ না বসে।'

আবু হানিফা (রহ.) বলেন—'আমি ১০ বছর আমার ওস্তাদ হাম্মাদ (রহ.)-এর সান্নিধ্যে থেকেছি। এরপর ইলমের নেতৃত্বের আসনে বসার জন্য আমার মনে আগ্রহ সৃষ্টি হলো। ইচ্ছে হলো, তাঁর সান্নিধ্য ত্যাগ করে নিজেই একটা মজলিশ বানিয়ে দারস দেওয়া আরম্ভ করি।'

ইলমের নেতৃত্ব গ্রহণের আগ্রহের কথা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এখানে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। এটি ছিল তাঁর সরল মনের বহিঃপ্রকাশ। ইমাম হানিফা (রহ.)-এর সমবয়সি যুবকরা যেখানে ইলমের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হওয়ার জন্য লৌকিকতার আশ্রয় নিত, নিজেদের মজলিশ আলাদা করে বিশুদ্ধ নিয়াতের বুলি আওড়াত, সেখানে তিনি কোনো লৌকিকতার আশ্রয় না নিয়ে স্পষ্টভাবে মনের অবস্থা তুলে ধরেছেন।

প্রিয় পাঠক! ইমাম হানিফা (রহ.) কীভাবে শিক্ষকতার আসনে আসীন হলেন, তা তাঁর মুখ থেকেই শোনা যাক। তিনি বলেন—'একদিন বিকালে আমি বাড়ি থেকে বের হলাম। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, আজই ইলমের মজলিশ করে আমি আলাদা দারস দেওয়া শুরু করব। কিন্তু মসজিদে এসে আমার ওস্তাদ হাম্মাদ (রহ.)-কে দেখে তাঁর থেকে আলাদা বসতে আমার মন সায় দিলো না। তাই তাঁর মজলিশেই বসে গেলাম।

সেদিন রাতে বসরা থেকে ওস্তাদ হাম্মাদ (রহ.)-এর জনৈক আত্মীয়ের মৃত্যুর খবর এলো। সে মৃত্যুর সময় অনেক সম্পত্তি রেখে যায়। হাম্মাদ (রহ.) ছাড়া তার আর কোনো উত্তরাধিকার ছিল না। তাই তিনি আমাকে তাঁর স্থানে বসার আদেশ করে বসরা চলে গেলেন।'